টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

পলিসি ব্রিফ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬:

অর্থপাচার প্রতিরোধ এবং ব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধারের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

৫৬

নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট

'এজেন্ডা ২০৩০' বা এসডিজি'র মোট ১৭টি বৈশ্বিক অভীষ্টের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ' করার কথা বলা হয়েছে। এসডিজি'র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি, এবং সূচক ২৩টি।

এসডিজি ১৬ অর্জনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সম্প্রতি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এই পলিসি ব্রিফ এসডিজি ১৬'র একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ১৬.৪, বিশেষকরে অর্থ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর লক্ষ্য অর্জনে আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি, বাস্তব পরিস্থিতি, এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

লক্ষ্য ১৬.৪

"২০৩০ সালের মধ্যে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো, ব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা এবং সকল প্রকার সংঘবদ্ধ অপরাধ মোকাবেলা করা"।

প্রস্তুতি

অবৈধ অর্থ প্রবাহ ও চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫), এবং অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ক পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। অর্থপাচার প্রতিরোধে যেসব প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি), এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব ভিন্ন। এছাড়া অর্থপাচার প্রতিরোধ ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটি, কার্যকর কমিটি, চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। অর্থপাচার সংক্রান্ত দুটি জাতীয় ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং দুটি খাতভিত্তিক (রিয়েল এস্টেট ও এনজিও) কাঠামোগত ঝুঁকি পর্যালোচনা সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থপাচার ও জঙ্গি অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য জাতীয় কৌশল (২০১৫- ২০১৭) প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও অর্থপাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করছে; বাংলাদেশ 'এগমন্ট গ্রুপ'-এর সদস্য যেখানে ১৫২টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ বিশ্ব শুল্ক সংস্থা ও রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স লিয়াঁজো অফিসেস-এর সদস্য। আর্থিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের জন্য ইতোমধ্যে ৫৫টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাস্তবতা

প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে বাইরে ও বাইরে থেকে দেশের ভেতরে অর্থপাচারের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৫-২০১৪ সময়ে বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের পরিমাণ ১২০% বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এই সময়ে পাচারকৃত প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আরেকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১১-২০১৬ সময়ে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের জমা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে - ২০১৫ সালে ৪,৬২৭ কোটি টাকা থেকে ২০১৬ সালে ৫,৫৬০ কোটি টাকা - যদিও কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী এর ৯৩% আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক লেনদেনের ভিত্তিতে পাওনা। অন্যদিকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অর্থ প্রবেশের পরিমাণ ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সাইবার অপরাধীরা যে ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি করে তার মধ্যে ৮১ মিলিয়ন ফিলিপাইনে ও শ্রীলংকায় ২০ মিলিয়ন ডলার পাচার করে।

চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য খুব বেশি নয়। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৯.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭২.৮১ কোটি টাকা) বাজেয়াপ্ত, ২০১৬-১৭ সালে জরিমানা বাবদ ০.৩৪ মিলিয়ন ডলার (২.৭৩ কোটি টাকা),এবং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে চুরি হওয়া ৩৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তবে অর্থপাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়। প্যারিসভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স-এর ৪০টি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স-এর বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক - এই ৪০টি মানদণ্ডের সাথে পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট ৬টি, বহুলাংশে কমপ্লায়েন্ট ২২টি, এবং আংশিক কমপ্লায়েন্ট ১২টির ক্ষেত্রে। ব্যাসেল এএমএল ইনডেক্স ২০১৭ অনুসারে অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮২তম।

অর্থপাচার প্রতিরোধে বেশকিছু কার্যক্রম চলমান। অর্থপাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিএফআইইউ ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক ও আর্থিক নয় এমন সংস্থা থেকে সন্দেহজনক অর্থবিনিময় প্রতিবেদন (এসটিআর) সংগ্রহ করে আইন প্রয়োগকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। ২০১০-২০১৪ সময়ের মধ্যে দুর্নীতি, অর্থপাচার, জঙ্গি অর্থায়ন, ওষুধপাচার, মানবপাচার, জুয়া, আত্মসাৎ, কর ও শুল্ক অবমুক্ত সংক্রান্ত ৩৮টি বৈদেশিক অনুরোধ পেয়েছে, অন্যদিকে ১৭টি অনুরোধ বিদেশে পাঠানো হয়েছে। অর্থপাচার মামলার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত দশটি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে দশটি দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে ২২২টি মামলা এখন পর্যন্ত অনিষ্পন্ন রয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

অর্থপাচার প্রতিরোধে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তার মধ্যে জাতীয় ও খাতভিত্তিক ঝুঁকি পর্যালোচনায় ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। দেখা যায় এই পর্যালোচনায় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর রাজনীতিকরণ, দুর্নীতিতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আঁতাত, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বোর্ডে সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের রাজনীতির সাথে ত্রিমুখী সম্পৃক্ততা চিহ্নিত করা হয় নি। এছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থপাচারের ঝুঁকি, যেমন সাম্প্রতিক ঋণ কেলেংকারি, নির্বাহী কমিটি বা বোর্ডে রাজনৈতিক নিয়োগ যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় নি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সিকিউরিটিজ ও আর্থিক নয় এমন নির্দিষ্ট ব্যবসা বা পেশার (ডিএনএফবিপি) দ্বারা অর্থপাচার কিভাবে হতে পারে সে সংক্রান্ত ঝুঁকি ও ধারণায় ঘাটতি রয়েছে। অর্থপাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলে কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সহায়তার দিক-নির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান। এছাড়া কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও ট্রাস্ট আইন ১৮৮২-তে কোম্পানি ও ট্রাস্টগুলোর জন্য 'বেনামী মালিকানা' সংক্রান্ত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয় নি।

অর্থপাচার প্রতিরোধে নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়। কোনো কোনো নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানে (যেমন দুদক, এনবিআর) সক্ষমতা ও নির্দিষ্ট মামলা পরিচালনা ইউনিটের অনুপস্থিতির কারণে অর্থপাচার সংক্রান্ত মামলার তদন্ত ও নিষ্পত্তিতে ঘাটতি রয়েছে, যেমন 'রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর' মামলার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, তদন্তের শুরুতে কার্যকরভাবে অর্থপাচার সংক্রান্ত অপরাধের তথ্য যাচাই না করা, এবং অবৈধ অর্থের উৎস সন্ধান ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি লক্ষ করা যায়। অর্থপাচার মামলা পরিচালনায় আদালত ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ওপর ভিত্তি করে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়ার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া ডিএনএফবিপিগুলোর তদারকিতে ঘাটতি, এবং অর্থপাচারের পরিমাণ নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচক যাচাইয়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতারও ঘাটতি রয়েছে।

সুপারিশ

১. দুদক, এনবিআর, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য অর্থপাচার তদন্ত ও মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ইউনিট থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সহজলভ্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

২. অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে অর্থপাচার মামলা ব্যবস্থাপনার কাঠামো তৈরি করতে হবে।

৩. অর্থপাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং চিহ্নিত করার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

৪. চুরি যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ আইনি কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৫. বেনামী মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও ট্রাস্ট আইন ১৮৮২ সংশোধন করতে হবে।

৬. অন্যান্য দেশের সাথে আর্থিক তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিময় নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh